সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ ● বুধবার ১৪ মার্চ ২০১৮ ● ৫ টাকা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র

অতি সুলভে তিন মাসের বেসিক কোর্স

অঙ্কন: স্বপন দেবনাথ

মাদার টেরেসা

শঙ্করলাল ঘোষাল

ভারতবাসী হিসেবে আমরা সত্যই গর্বিত - যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের এক বিদেশিনী আমাদের এই ভারতবর্ষকেই নির্বাচন করেছিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে। এমনই দয়াময়ী মহামানবী ছিলেন এই মাদার টেরেসা। মাদার টেরেসাকে সমস্ত বিশ্বের ক্যাথলিক চার্চ কোলকাতার সেন্ট টেরেসা হিসেবেই চেনে। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ২৬শে অগাষ্ট, ১৯১০ সালে কোসাভার এক আলবেনিয়ান পরিবারে। তাঁর জন্মস্থান স্কপজে শহর যা এখন মেসিজোনিয়ার রাজধানী। টেরেসা জন্মের পরদিনই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর পিতা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং টেরেসা যখন মাত্র আট বছরের, তাঁর মৃত্যু হয়। ভাই বোনদের মধ্যে টেরেসা সর্ব কণিষ্ঠ ছিলেন। শৈশব কাল থেকেই ধর্মীয় জীবনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষন ছিল। ১৯২৮ সালে ১৮ বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে আয়ারল্যান্ডে, সিস্টার অব লোরেটোর সঙ্গে যুক্ত হন। ইংরেজী ভাষা শিখে মিশনারীদের কর্ম ধারার সঙ্গে যাতে যুক্ত হতে পারেন, সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। সেখানেই তার নাম সিস্টার টেরেসা হয়। ১৯২৯ সালে ৬ই জানুয়ারী টেরেসা কোলকাতায় পদার্পন করেন।

এরপর ৬ পাতায়

নিবেদিতা

বাসুদেব ঘোষ

১৮৯৫ সাল। লন্ডনে লেডী মার্মোসনের ড্রইং রুম। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক শুভদিন। এক গৈরিক বসনধারী নবীন সন্যাসীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আয়ারল্যান্ডবাসী আটাশ বষীয়া এক নারী। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোন মোহ নেই। আছে শুধু ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ানোর আকুতি। এতদিনে বুঝি তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল।

মাত্র দশ বছর বয়সে পিতা স্যামুয়েলকে হারিয়ে তাঁর মধ্যে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো, মাতামহের স্নেহের পরশে তা কিছুটা দূর হলেও ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্টতা বৃদ্ধি পায়। লন্ডনের স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে Halifax কলেজ থেকে পাশ করে তিনি অধ্যাপনার প্রতি মনোযোগ দেন। আর সেই সময় থেকেই মনের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে থাকেন ঈশ্বরকে। এমন একজনকে খুঁজে বেড়াতে সচেষ্ট হয়েছেন যিনি মানবাত্মার বন্ধন মোচনে সক্রিয়, মানবের ভালোবাসার প্রতিক। মানুষের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করতে যিনি সচেষ্ট। যিনি নিজেকে ঈশ্বর ভাবেন না। কিন্তু ঈশ্বরকে সযত্নে বুকের মধ্যে স্থান দেন। সেই নররুপী নারায়ণ

এরপর ৬ পাতায়

ডিরোজিও

বিনয় ঘোষ

ডিরোজিওর জন্ম ১৮০৯ সালের ১০ই এপ্রিল। তাঁর পুরোনাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জাতিতে পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গি। সেসময় একদিকে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের মত মনীষীদের আবির্ভাব। ১৮০০ সালের অন্ধ কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে সংস্কার ক'রে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন তাঁরা। বাংলার তথা দেশের নবজাগরণের প্রভাতের আগমন ঘোষণা করেছিলেন। তারই মাঝখানে ডিরোজিওর-আগমন। সেসময় একদিকে হিন্দু কলেজকে ঘিরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণের দল প্রগতিপন্থী ভাবধারায় সমুজ্জল। তাঁর প্রধান গোঁড়া পন্থীদের নানা সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তখন সামন্ত্যযুগের শেষ। সামন্ত্যযুগের উত্তরসুরীরা জমিদারী অর্থ নিয়ে নানা ফূর্তিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে সমাজের বাল্য বিবাহ, কৌলিণ্য প্রথায় বহুবিবাহ, পৌত্তলিকতা

এরপর ৫ পাতায়

অ্যানি বেশান্ত

বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য

যে কয়েকজন অসাধারণ বিদেশী মহিলা ভারতবর্ষে এসে ভারতবাসীর সহিত একাত্ম হয়ে ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্য তুলে ধরেছিলেন শ্রীমতি অ্যানি বেশান্ত, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর লন্ডন শহরের নামকরা উড পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা লর্ড হ্যাথালের সম্পর্কীয় ভ্রাতা, একজন প্রতিভাবান ব্যাক্তি ছিলেন। অ্যানির মাতা একজন আইরিশ গুণী মহিলা, নাম এমেলি মরিস, ফ্রান্স থেকে আগত রাজাদের বংশধর। ৫ বৎসর বয়সে অ্যানি পিতৃহীন হন। স্বামীর মৃত্যুতে মিসেস উডের জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। সৌভাগ্যক্রমে মিস মরিয়ট নাম্নী একজন দয়ালু ভদ্রমহিলা অ্যানি উডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের মেয়ের মত সস্নেহে তাঁকে

এরপর ৭ পাতায়

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

সংঘ সংবাদ

সংঘের নিয়মিত পরিষেবাগুলি যথাযথ চলছে।

চিকিৎসা বিভাগঃ- এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ২০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে চিকিৎসার পরামর্শ এবং ওষুধ দেওয়া হয়। দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন রোগী পরিষেবা পেয়েছেন গত ২ মাসে। সম্প্রতি আর একজন ডাক্তারবাবু ডাঃ অমিতাভ ঘোষ সপ্তাহে ১ দিন করে পরিষেবা দিচ্ছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে ১০টাকা টিকিটের বিনিময়ে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। আগামী মাস থেকে ডঃ সুমিত্রা ব্যানার্জী হোমিওপ্যাথি কেন্দ্রে যোগ দেবেন। গত ২ মাসে দৈনিক গড়ে ৩৫-৪০ জন রোগী পরিষেবা পেয়েছেন।

গ্রন্থাগারঃ- বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১০ হাজার ও ততোধিক। পাঠকদের নিয়মিত পঠনের জন্যে দৈনিক পত্রিকা ও অন্তর ৮-১০টি সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা রাখা হয়।

গ্রন্থাগারের Stock-taking ও Cataloging- এর কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়েছে মাননীয়া তপতী গাঙ্গুলীর নিরলস প্রচেষ্টায়।

সম্প্রতি পাঠাগারে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে শিশু ও বয়স্কদের দুটি বিভাগে। গ্রন্থাগারে দৈনিক গড়ে ১৫ জন সদস্য / সদস্যরা বই-এর আদান-প্রদান করেন।

সেবা-নিবাসঃ- দুই শয্যা বিশিষ্ট ২৫টি ঘরের গত ২ মাসে গড়ে ৫০-৫৫% রোগী ও পরিবার আশ্রয় পেয়েছেন। রোগীদের রান্না-বান্নার সুবিধার জন্য গ্যাস-সরবরাহের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনমত বাসনপত্রও সরবরাহ করা হয়। পরিশ্রুত পানীয় জল ও রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা আছে। বিনোদনের জন্য দৈনিক পত্রিকা, ক্যারাম খেলার সরঞ্জাম ও টি. ভি. দেখার ব্যবস্থা আছে।

প্ল্যানেট ক্যুইয়ারের বিদেশীরা। ছবি: গৌতম সাহা

অতি শীঘ্রই হাসপাতালে যাতায়াতের সুবিধার জন্য মাননীয় বিধায়ক সুজিত বোসের উদ্যোগে একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করা হবে।

শিশু বিভাগঃ- প্রতি রবিবার সকালে প্রায় ৫০-৫৫ জন শিশু ও কিশোররা উৎসাহের সাথে অংকন শিক্ষার ক্লাস করে। ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর একজন প্রশিক্ষকের প্রয়োজন। এছাড়া ঐ সকল ছাত্র/ছাত্রীদের শরীরচর্চার জন্য এ্যারোবিকস' পদ্ধতিতে ব্যায়ামের অনুশীলন শুরু হয়েছে। বৎসাবান্তে এদের আঁকার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যাবস্থাও করা হয়।

কমপিউটার প্রশিক্ষণঃ- ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে কমপিউটারের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য গান্ধী সেবা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক ফি-এর বিনিময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণ পায়। সপ্তাহে দুদিন শনি/রবিবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রায় ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী পর্য্যায়ক্রমে সাতটি কমপিউটারে দুজন শিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষণ লাভ করে। কমপিউটার কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে শ্রী অবল সাহা ও অভীক গুহঠাকুরতা।

মাণিক্য মঞ্চ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ- সংঘের মাণিক্য মঞ্চে প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন সংস্থার পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিগত দু মাসে প্রায় দশটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়েছে। যেমন, সংঘের বিজয়া সম্মিলনী, ইকো আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী ও স্মরণসভা, আত্মবিকাশ পরিচালিত বিজয়া সম্মিলনী ও সাহিত্য সভা, ইকো আয়োজিত নাটক প্রদর্শন, সমর্পণ সংস্থা আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠান, নব অগ্নিবীণা আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠান, স প্রিয় সংসদের আয়োজিত অনুষ্ঠান, সত্যেন্দ্র আর্ট ও কালচার ইনস্টিটিউটের ছবির প্রদর্শনী এবং অঞ্জলি জুয়েলার্স আয়োজিত অনুষ্ঠান সংঘের সভাগৃহটির সংস্কার ও মাণিক্যমঞ্চের সুসজ্জিত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সভাঘরটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সঙ্ঘের পিকনিকে। ছবি: অভীক গুহঠাকুরতা

স্বনির্ভরতা প্রকল্পঃ- শ্রীমতি বীণা মাকালের পরিচালনায় ৮-১০ জন মহিলা সপ্তাহে দুদিন করে সেলাই ও পোষাক তৈরীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েকজন বাড়ীতে বসে সেলাই ও টেলারিং এর কাজ করে কিছু রোজগার করছেন।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল

হাসপাতালের বর্হিবিভাগে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ৪০ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুরা রোগী দেখেন মাত্র ১০০-২০০ টাকা ফি-এর বিনিময়ে। প্যাথোলজি বিভাগে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় অনেক কম খরচে। এছাড়া রেডিওলজি-বিভাগে ডিজিটাল এক্সরে, ইউ.এস.জি ও ই সি জি করানো হয় অপেক্ষাকৃত কম খরচে। প্রতিদিন ডেন্টাল ক্লিনিক ও আই-ক্লিনিকেও স্বল্প ব্যায়ে সযত্নে পরিষেবা দেওয়া হয়।

বিগত দুই মাসে Oct ও Nov বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল যথাযথভাবে ৫৪০ জন ও ৬৩৮ জন। প্যাথোলজি বিভাগে পরীক্ষা করা হয়েছে ২১৬টি। ডেন্টাল বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৮ ও ৬৯ জন এবং চক্ষু বিভাগে ৯টি ও ৩১ টি। উল্লেখযোগ্য অক্টোবর মাসে কয়েকদিন অনিবার্য্য কারণে চক্ষু বিভাগ বন্ধ ছিল। এখানকার স্বল্প ব্যায়ের চিকিৎসা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দিলীপদা স্মরণে

সংঘের আজীবন সদস্য এবং কার্যকরী সমিতির দীর্ঘ ১০ বছরের সক্রিয় সদস্য শ্রদ্ধেয় দীলিপ সেনগুপ্ত প্রয়াত হলেন গত ১৩ ই নভেম্বর, ২০১৭। প্রয়াত মালা রায় ও দিলীপদা যৌথভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। সমাজসেবা, কর্মোদ্যগী ও উৎসাহী দিলীপদা ছিলেন সকলের প্রিয়। জন্ম ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ফরিদপুরে অধুনা বাংলাদেশে। ছাত্রজীবন প্রথমে স্কচিশ চার্চ স্কুল ও পরে সিটি কলেজ। কর্মজীবনের প্রথমে সরকারী প্রকল্পে সমবায় সমিতি গঠনে নদীয়া জেলায় নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ সেন-র‍্যালে কোম্পানীর দীর্ঘদিন চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে কাঁকুড়গাছির CIT হাউসিং-এ বসবাস করতেন। ১৯৮৬ সাল থেকে শ্রীভূমিতে বসবাস। তাঁর স্ত্রী, সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্র, পুত্র বধূ ও নাতি বর্তমান। সংঘের সকলে দিলীপদার বিদেহী আত্মার শান্তি-কামনা করি, তাঁর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সংঘের নানামুখী কর্মকান্ডের শরিক হতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন ও মুক্ত হস্তে দান করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই

১।	গৌরব ও নূপুর ঘাই	৬৪,৪৫২
২।	কবিতা সেন	১০,০০০
৩।	সাহানা সেন	১০,০০০
৪।	সুধীর চন্দ্র সাহা	১০,০০০
৫।	শীর্ষেন্দু সিনহা	১০,০০০
৬।	অন্বেষা সাহা	৫,০০০
৭।	বাসন্তী দত্ত	৫,০০০
৮।	তৃণাঞ্জণ সাহা	৫,০০০
৯।	জয়ন্তী মজুমদার	৫,০০০
১০।	সোমা সাহা	৫,০০০
১১।	স্বরজিৎ রায়	৪,০০০
১২।	মঞ্জরী মিত্র	৪,০০০
১৩।	সুরিন্দর হান্ডা	২,৫০০
১৪।	গীতা মুখার্জী	২,৫০০
১৫।	আশুতোষ ঘোষ	১০০০
১৬।	শৈবাল মুখার্জী	৫০০

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

প্রতি বছরের মত এই বছরে ও আমরা ফ্রান্সের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "PLANETE COEUR" এর কাছ থেকে চিকিৎসা পরিষেবা ও সেবা নিবাসের উন্নয়ণের জন্য বার্ষিক অনুদান পেয়েছি। এই সংস্থা দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ সংঘের জল সেবা মূলক কর্মকান্ডের নিরবিচ্ছিন্ন অংশীদার।

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র - আত্মিক সম্পর্ক

বরুনদেব ঘোষ

হার্দ্য ঘনিষ্ঠতা তো অনেক পরের কথা, আপাত দৃষ্টিতে ভগিনী নিবেদিতা ও জগদীশ চন্দ্র বসুর মধ্যে কোন যোগাযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। বড় জোর সভা-সমিতিতে বার কয়েক সৌজন্যমূলক আলাপন হতে পারত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাটিগনিতের মতো স্থির নির্ধারণ যোগ্য নয়। ভারতে পদার্পণের অল্প দিন পরেই ভগিনী নিবেদিতা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বাড়ি গেলেন তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণাগার দেখতে। সেই প্রাথমিক আলাপের মুগ্ধতা কালক্রমে জীবনব্যাপী ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়। পরিচয়ের দিনেই নিবেদিতা অদ্বৈততত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জগদীশচন্দ্র তখন স্নিগ্ধ হাস্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন-অদ্বৈত-জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ চান? জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব যে এক জিনিষ, এ আপনি বিশ্বাস করেন? উত্তরে নিবেদিতা বলেন উপনিষদগুলোতে তো তেমনই ইশারা আছে (আর অনুভব করলেন ভারতবর্ষীয় এই বৈজ্ঞানিকটির সঙ্গে তাঁর মনের কম্পাঙ্ক কোথায় যেন মিলেছে)। ধীরে ধীরে নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি ধীরে ধীরে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। যে আর্থিক কচ্ছতার মাঝে জগদীশচন্দ্র একাগ্রমনে তাঁর আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা নিবেদিতাকে সহানুভূতিশীল করে তোলে। নিবেদিতার মনে পড়ে যায় আমেরিকার স্টেট সেনেটর ও ধনী ব্যাবসায়ী জোসেফ জি থর্পের কন্যা, বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান বেহালাবাদক ওলিবুলের বিধবা পত্নী সারা ওলিবুলের কথা। অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালিনী ও ধনী এই মহিলার পৃষ্টপোষকতায় তৎকালীন বেলুড় মঠ নির্মিত হয়। জগদীশচন্দ্রের তখন এটুকুর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর আবিস্কার আলোচনা হতে লাগল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নানা জায়গা থেকে আগত অভিনন্দন পত্র তাঁর আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলল। শুধু পৃষ্টপোষককে প্রভাবিত করাই নয়, ইউরোপীয় ফিচার লেখিকা হিসাবে পরিচিত দেশীয় সংবাদপত্রে নিবেদিতাকে যে প্রতিপত্তি দিয়েছে তাকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের অনুকুলেই ব্যাবহার করে চললেন।

নিবেদিতার প্রামাণ্য জীবিকার লিজেলরেম বলেছেন-বসু আর নিবেদিতার জীবনব্যাপী সৌহার্দ্য বাড়ো অদ্ভুত। দুজনেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের নিজের আদর্শ আঁকড়ে ছিলেন। যে আদর্শ ছিল পরস্পরের একেবারে বিপরীত। তিনি একদিন জগদীশচন্দ্রকে প্রস্তাব দেন যে তাঁর গবেষণালব্ধ সব কিছুই লিখে ফেলা উচিত কারণ কাজের কথা লিখে রাখা দরকার। এর উত্তরে জগদীশচন্দ্র বলেন-যা তার মনে বিদ্যুতের চমকের মতো খেলে যাচ্ছে তাঁকে তিনি বাস্তব রূপ দেবেন কীভাবে? এর উত্তরে নিবেদিতা যা বলেন, তা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী কথা। তিনি বলেন-"আমি তো আছি। আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মতো তোমার কাজ করবে। মনে কর এ লেখা তোমারই'' তাঁর এই দুটি কথা দুঃসাহসী। প্রধাণতঃ দুটি কারণে-প্রথমত জগদীশচন্দ্রের জটিল বিজ্ঞান ভাবনাকে লিখিত রূপ দেওয়া একডন আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে অদীক্ষিত লেখিকার পক্ষে কতটা দুরুহ তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত মূলত নারীশিক্ষা প্রচারের গুরু দায়িত্ব বহনের উদ্যেশ্যই তাঁর এদেশে আগমন, সেই দায়িত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন উচ্চকোটির বিজ্ঞান সাধনায় মদত দেওয়ার জন্য তাঁর এতটা উদ্যম নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠতেই পারে কিন্তু নিবেদিতা এসব নিয়ে এতটুকুও ভাবিত নন। নিবেদিতার বোন শ্রীমতী উইলসনও লিখেছিলেন যে, ভারতের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসাই বসুর প্রতি ভালবাসার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত। সেই সর্বাঙ্গীন ভালবাসা ছিল তীব্র আবেগময় অথচ পবিত্র। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানা যায় যে, বস ুনিবেদিতা অপেক্ষা বয়সে বড়ো ছিলেন এবং নিবেদিতা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সাধারণত নিবেদিতা বসুকে Man of Science বলে অভিহিত করলেও একাধিক পত্রে নিবেদিতা বসুকে Bairn (বেয়ার্ন) বলে অভিহিত করেছেন। এটি একটি স্কটিশ শব্দ যার অর্থ শিশু। বসু নিবেদিতার থেকে দশ বছরের বড়, তবু নিবেদিতার কাছে তিনি শিশুর মত প্রতীয়মাণ হতেন। কোনরূপ বাধা পেলে বা নিরুৎসাহ বোধ করলে নিবেদিতা তাঁকে স্নেহময়ী জননীর মতো উৎসাহ দিতেন। জোর করে কাজে প্রবৃত্ত করতেন। জগদীশচন্দ্র নিজেও বলেছেন যে হতাশ ও অবসন্ন বোধ করলে তিনি নিবেদিতার কাছে আশ্রয় নিতেন। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রার্ড ফোর্ড ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের কথা বলেন। এই সময়ে নিবেদিতা ও সারাবুল বসু দম্পতিকে আগলে রেখে সমস্ত ব্যাবস্থা করেন। এরপর সুস্থ হয়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। কিন্তু অবাক কান্ড যে চিঠির কোথাও তিনি নিবেদিতা বা সারাবুলের নাম উল্লেখ করেন নি। যাদের তত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা সম্ভব হল। অথচ এই রোগশয্যার সময়েই তিনি একদিন নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, সকলে জানে ভারতীয়দের উত্তম কল্পনাশক্তি আছে এখন তাকে প্রমাণ করতে হবে গবেষণার কাজে তার অভ্রান্ততা এবং অনঢ় অধ্যাবসায়ের শক্তির মাধ্যমে। জগদীশচন্দ্র যেন তাঁর গবেষণার সাফল্যে পরাধীন এক জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার দায় নিজেই নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। এই উদ্বেগের সময় নিবেদিতাই বৈজ্ঞানিকের চারপাশে এমন এক অক্ষয় শক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যা তাঁর পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক ছিল। জগদীশচন্দ্র যখন ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে, তখন বিকালে হাঁটতে বেরিয়ে এক যন্ত্রপাতির দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ান এবং দেখতে দেখতে এক নতুন যন্ত্রের রূপরেখা তৈরী করে ফেলেন। যন্ত্রটি তৈরীও হয়ে যায়। নিবেদিতা স্বভাবতই উচ্ছসিত। মিস্ ম্যাকলাউডকে এক পত্রে তিনি তাঁর এই উচ্ছাসটি প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন "ও যেন আকাশচারী, একটার পর একটা সত্য করছে, যন্ত্রের পর যন্ত্র উদ্ভাবন করছে দীপ্ত সহজবোধ রূপ আবিস্কার ধরছে গণিতসিদ্ধ বাস্তবে।" ১৯০১ সালের ১০ই মে ইংল্যান্ডের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের শক্রবাসরীয় সান্ধ্য সভায় আনুপূর্বিক বিবরণ নিবেদিতা দীর্ঘপত্রের আকারে রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি পড়ে মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র কবিবরকে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তাঁর এই উচ্ছসিত প্রশংসার দাবিদার অবশ্যই নিবেদিতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথও কিন্তু নিবেদিতার এই ঋণ স্বীকার করেননি। শুধু রচনাটিতে জানিয়েছেন - এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরেজ মহিলার বিবরণ তিনি স্থানে স্থানে অনুবাদ করেছেন। হায়, নিবেদিতার পক্ষে এই পরিচয় কত ক্ষুদ্র ও অপত্তিকর। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রিভিউ অফ্ রিফিউজ' পত্রিকায় সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যাক্তিদের চিত্র সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী ছাপা হত। ১৯০১ সালের জুন মাসে নিবেদিতা A character sketch of Dr. Bose- প্রতিবেদনটি লিখে জমা দেন। কিন্তু লেখাটি অমনোনীত হয় কারণ নিবেদিতার ভাষায় "Now, Mr. Stead (editor of the paper) refused it on the ground, that it is too much India and too little Bose. However, I am writing in the hope of final acceptance. গবেষক শঙ্করী প্রসাদ বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, যে বিশাল কল্পনা ও আবেগ নিয়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর চরিত্র চিত্রণ এঁকেছিলেন, উইলিয়াম স্টেডের স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁব পূর্ণ মূল্য স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না।'' নিবেদিতা সেভাবে লিখেছিলেন সেভাবে ছাপাও হয়নি। নিবেদিতার লেখাটি খন্ডিত ও পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০২ সালে বইটি প্রকাশিত হয় কিন্তু তার আগেই নিবেদিতা বৃহত্তর কর্মকান্ডের তাগিদে ইউরোপ ত্যাগ করে ভারতে পৌঁছান। নিবেদিতার এই সিদ্ধান্তকে কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নিবেদিতার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, আমার সাফল্যের চেয়ে ভারতই তোমার বড় হল।'' নিবেদিতার ওপর অভিমান করে তিনি তাঁকে চিঠিপত্র লেখাই বন্ধ করে দেন। ১৯০২ সালে Longman, Green & Co. জগদীশচন্দ্রের প্রথম বই Response in the living and non-living প্রকাশ করেন, এই বইটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের যুগপৎ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যকীর্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই প্রশংসা ও অভিনন্দনের অনেকটাই নিবেদিতার প্রাপ্য অর্থাৎ বলাই যায় যে নিবেদিতার কলম লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্র এই গ্রন্থের কোথাও নিবেদিতার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এমনকি লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত পত্রে জানাচ্ছেন "এতদিন সংগ্রামে ব্যাস্ত ছিলাম শুনিয়া সুখী হইবে। সর্বত্রই জয়সংবাদ''। তখনও এই সংগ্রামে তাঁর সহযোদ্ধাটির কথা অন্যায়ভাবে অনুক্ত রইল।

৮ই নভেম্বর ১৯০২ সালে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার আবার সাক্ষাৎ হল কলকাতায়। তাদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তারা নিজেরাই মিটিয়ে নেন। মধ্যস্থতা করেন সারাবুল। জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গবেষণাগ্রন্থ Plant Response as a means of physiological Investigation লেখার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৪ এর অক্টোবর মাস থেকে। জগদীশচন্দ্র তার মনের ভাবগুলোর খসড়া একটা কাগজে লিখে যেতেন, পরদিন দেখতেন সেগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা পত্র রচনায় নিবেদিতার ভূমিকা কতটা ছিল তার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ

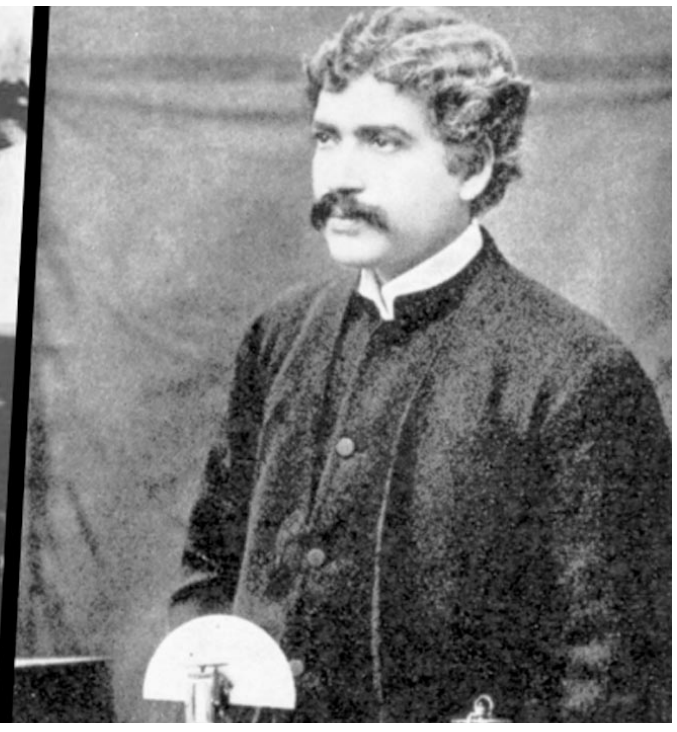

এরপর ৫ পাতায়

সেবক
২৮ ভাদ্র ১৪২৩ বৃহস্পতিবার ● ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

লেটার অফ আন্ডারটেকিং

কোনও গ্রাহকের নামে ব্যাঙ্কের 'লেটার অফ আন্ডারটেকিং' মানে, সেই গ্রাহকের ঋণ সুদসমেত শোধ দেওয়ার নিঃশর্ত অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারপত্র দেখিয়ে একজন ভারতীয়, সহজে দেশীয় ব্যাঙ্ক থেকে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ পেতে পারেন। ২০১১ সালে মুম্বইতে পিএনবি-র ফাউন্টেন শাখায় 'নীরবে' লেটার অফ আন্ডারটেকিং করিয়ে নিয়ে একাধিক ভারতীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক শাখা থেকে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সঙ্কেত করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি জানা যায়, কোনও ব্যাঙ্কের বৈদেশিক শাখার কোনওরকম ধার শোধ না করেই 'নীরবে' তাঁরা আজ বিদেশী! অথচ, ওঁরাও হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তীতে 'ভারতীয়ই'। দেশী-বিদেশী সাহায্য পর্যাপ্ত না পেয়েও ভারত বর্ষে রেখে গেছেন কী গভীর ছাপ! এবারের পত্রিকা 'সেবক'-এর প্রচ্ছদ সেই সমস্ত 'সেবকদের' নিয়ে যাঁরা কোনওরকম 'লেটার অফ আন্ডারটেকিং ছাড়াই আমাদের দেশকে দিয়ে গেছেন অফুরান্ত দিশা, সম্পদ এবং সেবা।

গান্ধী সেবা নিবাস

ক্যানসার রোগী ও সাথীর জন্য অতি অল্প খরচে নির্ভয়ে
সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সেবা নিবাস
গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কোলকাতা-৪৮
শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে

পথনির্দেশ

বাস - আর জি কর হাসপাতাল থেকে - 30C, 215/1, 211A
নিলরতন হাসপাতাল, শিয়ালদহ থেকে - 221. 223, 44, 45
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে - 46, 12C/2
বিরাটি-বাগুইআটি-এয়ারপোর্ট মিনি
লেকটাউন ভি. আই. পি. রোড মোড় স্টপেজ

প্রয়োজনে যোগাযোগ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (033) 25214011
দীপা দত্ত: 9007833036, অপূর্ব কুন্ডু: 9593576084
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: 9836133762 গৌতম সাহা: 9432000260

চার্লস ফ্রীয়র এ্যান্ড্রুজ ১২-০২-১৮৭১-৫-৪-১৯৪০

এ্যান্ড্রুজ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ব্যাতিক্রমী মানুষ। মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ বি. আর. আম্বেদকার সহ বহু সমসাময়িক বিশিষ্ট ভারতীয়র অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একনীষ্ঠ শুভাকাঙ্খী ও সমর্থক ছিলেন।

এ্যান্ড্রুজের জন্ম গ্রেট ব্রিটেনের নর্থাম্বারল্যান্ডে, পিতা ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের বিশপ। বারমিংহ্যামের কিং এডওয়ার্ড স্কুল ও কেমব্রিজের পেমব্রোক কলেজে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ১৮৯৬ সালে বিশপ হিসেবে দক্ষীণ লন্ডনের কলেজ মিশনে যোগ দেন। তার পরের বছর Westcott House Theological College এ সহ-অধক্ষ্য হিসেবে নিযুক্ত হন।

এ্যান্ড্রুজ ভারতবর্ষে আসেন ১৯০৪ সালে, দিল্লীর Cambridge Mission School এ দর্শনশাস্ত্র পড়াতে। ভারতবর্ষে এসে উনি প্রথমেই প্রত্যক্ষ করেন যে সর্বস্তরের ভারতীয়রা ব্রিটিশদের দুর্বিসহ জাতীবিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন। মানবদরদী ও সংবেদনশীল এ্যান্ড্রুজ ১৯০৬ সালে Civil and Military Gazette এ একটি খোলা চিঠি লেখেন, ভারতীয়দের পক্ষে। এর পর দ্রুত এ্যান্ড্রুজ জড়িয়ে পড়েন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসুচীর সাথে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম, সক্রীয় ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে পরিচিতি পান উনি।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পরিচয় হয় এ্যান্ড্রুজের এবং শুরু হয় বন্ধুত্ব ও দুই সহ-যোদ্ধার যাত্রা। শান্তিনিকেতনে গিয়ে গুরুদেবের আশ্রমের কাজে লিপ্ত হন এ্যান্ড্রুজ। লেখালিখি করেন জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণব্যাবস্থার বিরুদ্ধে। এর পর কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের অনুরোধে এ্যান্ড্রুজ চলে যান দক্ষীণ আফ্রিকা সেখানে কর্মরত ভারতীয় বংশোদ্ভুদের অধিকার সংরক্ষণের লড়াইতে সাহায্য করতে।

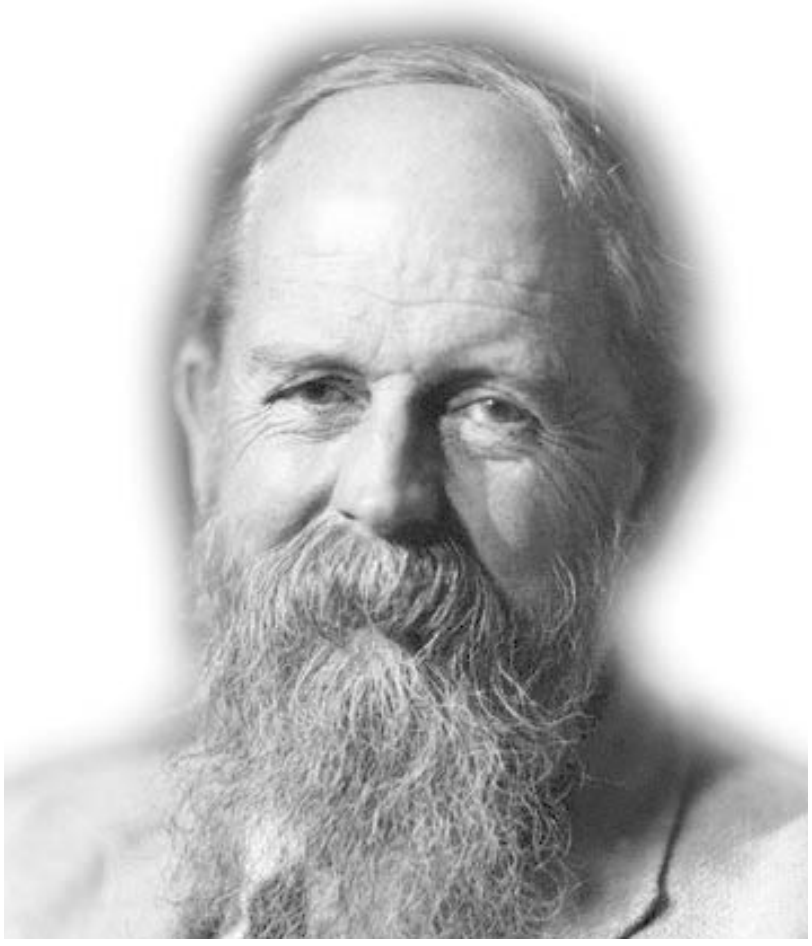

দক্ষীণ আফ্রিকায় গিয়ে এ্যান্ড্রুজের আলাপ হয় গান্ধীর সাথে, শুরু হয় আর এক যুগান্তকারী বন্ধুত্বের যাত্রা। গান্ধী তখন ন্যাটাল শহরে ভারতীয়দের হিতার্থে গড়ে তুলতে চাইছেন আশ্রম, সংবাদপত্র The Indian Openion তখন সবে মাত্র শুরু করেছেন। এই সমস্ত কাজেই গান্ধীর সাহায্য করেছিলেন এ্যান্ড্রুজ। মূলতঃ এ্যান্ড্রুজের অনুপ্রেরনাতেই গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৯১৪ সালে। দেশে ফিরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করেন গান্ধী এবং ছায়াসঙ্গীর মত পাশে থাকেন এ্যান্ড্রুজ। Christian anarchism-র দ্বারা প্রভাবিত গান্ধীর অহিংসার ধারনা, এ্যান্ড্রুজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

১৯২৫ সালে বাইকম সত্যাগ্রহ। ১৯২৩ সালে আম্বেডকারের সাথে দলিত সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া নির্ধারন করা, সব কিছুতেই ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের মূলস্রোতে মিশে গিয়েছিলেন এ্যান্ড্রুজ। গান্ধী ও St. Stephen's College এর ছাত্ররা এক সময় তাকে "দীনবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করলেন। বিদেশ থেকে আহুত আর্তের এইরূপ পরম বন্ধু আর এক প্রতিনিধি বোধ হয় ভগিনী নিবেদিতা।

এক সময় অবশ্য গান্ধী ও এ্যান্ড্রুজের বন্ধুত্বেও চির ধরল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করবার নির্নয়কে মেনে নিতে পারলেন না এ্যান্ড্রুজ। গান্ধীও এক সময় মন্তব্য করলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত ও সংগঠিত হওয়া শ্রেয়। আনুমানিক ১৯৩৫ সালে এ্যান্ড্রুজ ফিরে গেলেন ব্রিটেনে। ছাত্রদের মধ্যে Radical Discipleship এর মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি কোনদিনই। ১৯৪০ সালে কলকাতায় এসেছিলেন, এখানে দেহ রাখেন তিনি। লোয়ার সারকিউলার রোডের খ্রীষ্টান গোরোস্তানে তিনি সমাধিস্ত।

এন্ড্রুজের স্মৃতিতে তৈরী দুটি কলেজদীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ কলেজ ও দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান।

১৯৭১ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে ছাপা হয় একটি বিশেষ ডাক টিকিট দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজের স্মৃতির উদ্দশ্যে।

এ্যান্ড্রুজের বিশেষ কিছু লেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ Hakim Ajmal Khan: A sketch of his Life and Causes (1922), The Renaissance in India: Its Missionary Impact (1912), Non-Co-operation(1920), Mahatma Gandhi: His Life and Works (1930)।

চার্লস ফ্রীয়র এ্যান্ড্রুজের মত ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবন, চিন্তাধারা ও কাজের চর্চা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে জানা ভারতীয়দের বিশেষ কর্তব্য কারণ তাহলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস সর্ম্পকে আমাদের জ্ঞান আরো সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে।

সংযুক্তা রায়
সহ অধ্যাপিকা, রাষ্ট্র- বিজ্ঞান বিভাগ
বেথুন কলেজ, কলকাতা

ডিরোজিও

১ পাতার পর

প্রভৃতি সমাজে চলছিল। জমিদারী গিয়ে তখন মুন্সী, দালাল, গোমস্তা, বেনিয়াদলের উদ্ভব। তারা ইংরেজদের হাতে পুতুল।

সেসময় উচ্চশ্রেণীর সামান্য অংশ ইংরেজী শিখতে আগ্রহীইংরেজদের সঙ্গ লাভ ক'রে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করা। ইংরেজ রাজত্ব চলছে কিন্তু তারা তখনও দেশের সামাজিক বিষয়ে হাত দেয়নি। ইংরেজরা খ্রীষ্ঠধর্ম প্রচারে উন্মুখ। অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দুরা এসবের বিপক্ষে সরব। তৎকালীন হিন্দুকলেজের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা সামাজিক এই নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদেরই শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও।

ডিরোজিওর পিতা একটি হাউস এর পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর দুই বিয়ে ছিল। ডিরোজিও প্রথম স্ত্রীর সন্তান। ওঁর আরও দুইভাই ও দুই বোন ছিল। ভাইরা দুঃশ্চরিত্র ছিল। বোন এমিলিয়া পিতা ও ডিরোজিও সকলে একসঙ্গেই থাকতেন। ধর্মতলায় মৌলালির এক দর্গার কয়েক গজ দূরে নিজেদের বাড়ীতে থাকতেন। এখানেই তাঁর জীবনের ২২ বছর কাটে। ডিরোজিও দুবছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ডেভিড ড্রাম্পেটের কাছে পড়াশোনা শিখেছিলেন। ড্রাম্পেট স্বাধীনচেতা, প্রগতীপন্থী ছিলেন। তিনি সাহিত্য, দর্শন নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করতেন। একটি উদার, সুস্থ, উন্নত মনের মানুষ তিনি ছিলেন। ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে, ডিরোজিও একটি সৌদাগরী অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর ভাগলপুরে যাওয়ার সুযোগ আসে। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও পরিবেশে তিনি মুগ্ধ হন। সেখানেই ডিরোজিওর কাব্যচর্চার শুরু। ইন্ডিয়া গেজেট নামক পত্রিকায় বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। এভাবেই তিনি তৎকালীন সুধী সমাজে পরিচিত হন। কোলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তিনি তখন মাত্র ১৭ বছর বয়সের যুবক। ডিরোজিও ছিলেন এক প্রতিভাবান শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে ছাত্রদের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে অচিরেই। তিনি ছাত্রদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন। ছাত্রদের সঙ্গে বয়সের তফাৎ ছিল মাত্র চার বছরের। তাই ছাত্রদের মনের ক্ষুধা ও দিশা তিনি খুব ভালো বুঝতে পারতেন। এই জ্ঞানতাবস ছাত্রদের শিক্ষা প্রাণ ঢেলে দিতে লাগলেন। চরিত্র মাধুর্য্যে বলীয়ান, সাহসী, প্রগতীপন্থী ছিলেন এবং সেই উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ, দর্শন, সাহিত্য, শাস্ত্র ছাত্রদের সঙ্গে চর্চা করতেন। পড়াশুনা কেবলমাত্র ক্লাসেই আবদ্ধ ছিল না - তাঁর বাড়ীতেও ছাত্রদের অবাধ গতিবিধি ছিল। ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আগ্রহ দেখে মাণিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ীতে নিয়মিত আলোচনা সভা, সাহিত্য চর্চা হত।

ডিরোজিওর তত্ত্বধানে ছাত্ররা মিলে "একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন সংস্থা" তৈরী হয়। ছাত্ররা যাতে স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারে তাঁর প্রচেষ্টা সবসময় ছিল।

পার্থেলিন নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা সরব হয়েছিল। ডিরোজিওর ছাত্রদের অভিভাবকরা এতে প্রমাদ গোনেন।

তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের একজরুরী সভায় তৎকালীন অধ্যক্ষ ১৮২৩ সালে একটি প্রস্তাব আনেন। প্রথম প্রস্তাবে ডিরোজিও পন্থীদের দল ভারী হওয়ায় তা পরিবর্তন ক'রে দ্বিতীয় সভায় তা আবার পরিবেশন করা হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিরোজিওকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে বলা হয়। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক উইলসন্।

হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করার পর ডিরোজিও সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় মন দেন। তাঁর কাব্যের সংকলনের নাম ফকির অব জাঙ্গিরা।

ডিরোজিওর প্রগতিশীল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন কৃষ্ণবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিক সাহিড়ি, শিবচন্দর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ - এবং আরও অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এঁরা সকলেই বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে নিজেদের স্ব স্ব মহিমায় নাম করে নিয়েছেন।

ডিরোজিওর নাম অনুসারে একটি ডিরোজিয়ান যুগ তৈরী হয়। একটি স্বতন্ত্র অধ্যয় শিক্ষিত জগতে সংযোজিত হয়েছিল। তাঁর কিছু ছাত্রদের মধ্যে কিছু অসংলগ্ন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল- কিন্তু সেগুলি একেবারেই কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র। এসব ঘটনার জন্য ডিরোজিও উজ্জ্বলতাকে কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না।

১৮৩৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বহু ছাত্র ও অনুরাগী শিষ্যদের রেখে মাত্র ২২ বছর বয়সে ডিরোজিও পরলোক গমন করেন। অধ্যাপক ডিরোজিওকে আজও দেশ সম্মান জানায়।

ঋণ স্বীকার -- বিদ্রোহী ডিরোজিও

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র

৩ পাতার পর

পাওয়া যায় ১২ জুন ১৯০৫ সালে লেখা শ্রীমতী বুলের চিঠি থেকে। এখানে তিনি জগদীশ চন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করেছেন যে তিনি (জগদীশচন্দ্র) যেন আনুষ্ঠানিক ভাবে নিবেদিতাকে তাঁর লিটারারি একজিকিউটার করেন এবং লিখিত ভাবে সেটা যেন হয়। কিন্তু হায়, সারা বুলের এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে উত্তরকালে কেউ এত অজ্ঞ থাকতে পারত না। ১৯০৬ সালে জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় বইটি প্রকাশিত হয়, কিন্তু এবারেও কোথাও নিবেদিতার নাম উল্লেখ মাত্র নেই। (প্রব্রাজিকা মুক্তি প্রানাও লিখেছেন - ১৯০১ সাল থেকে নিবেদিতা বসুর গবেষনা কার্যে সাহায্য করছেন)। ১৯০২-১৯০৭ সাল পর্যন্ত বসুর তিনখানা পুস্তক - Living and Non Living, Plants Response, Comperative Electrophysiology এবং পরবর্তী Irritability of plants এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থই নিবেদিতা কর্তৃক লিখিত, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জগদীশচন্দ্রের প্রবল অনীহা। পরবর্তীকালে প্রবাসী প্রত্রিকায় 'জগদীশচন্দ্র' শীর্ষক এক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানিয়েছেন যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহ দাত্রী হিসাবে এবং মূল্যবান সহায়করুপে পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহান নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে বলার যোগ্য।

১৩ ই অক্টোবর ১৯১১ সালে দার্জিলিং-এর রায়ভিলায় নিবেদিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে জগদীশচন্দ্র বহুদিন ধরে নিদারুন মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে এই অবসাদগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠেন ও পুনরায় কর্মযজ্ঞে সামিল হন। কিন্তু তথাপি তিনি নিবেদিতা সম্পর্কে মৌন থাকেন। তবে বন্ধুবর কুমুদবন্ধু সেনের কাছে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক পত্রে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছেন - "নিবেদিতা প্রতিভা শালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উঁচুতে। তাঁর ত্যাগ অতুলনীয়, তিনি যদি পাশ্চাত্য দেশে থেকে কাজ করতেন - যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত। মনে মনে শ্রদ্ধা করি তাঁর শ্রেষ্ঠতাকে। স্বামীজী তাঁর যথার্থই নামকরণ করেছিলেন - 'নিবেদিতা' , তেমনই জগদীশচন্দ্র শ্রীমতি উইলসনকে ১৯১৬ সালের অক্টোবরে এক চিঠিতে লেখেন, "আমরা ১৩ তারিখটি (যা নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদযাপন করছি।

'যে শক্তি প্রতিদিন আমার মধ্যে জাগছে। যেভাবে আমি উত্তরোত্তর ভার বহন করে চলেছি, যা এককালে সুদূর স্বপ্নের বিষয় ছিল। এই সকলের মধ্যে থেকে আমি ক্রমেই বুঝতে পারছি, অমরতার যথার্থ অর্থ কি। যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি যা একা কোন মানুষের পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব- তাহলে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।' এই চিঠির কোথাও জগদীশচন্দ্র সরাসরি নিবেদিতার নাম উল্লেখ করেননি। যেমন করেননি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিশাল স্থাপত্যের কোথাও। কিন্তু বিজ্ঞান মন্দিরের অন্দরমহলে খোঁজ করলে আমরা অবশ্যই পাব নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কৃতজ্ঞ জগদীশচন্দ্রকে। বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ পথে ফোয়ারার ধারে জপমালা হাতে এক নারীর রিলিফ মূর্তি আছে, যার পরিচয় কিছু লেখা নেই। কিন্তু নিবেদিতার চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে তার খুব নিকট সাদৃশ্য আছে। তবে নন্দলাল বসু কর্তৃক ডিজাইন করা ঐ মূর্তি যে নিবেদিতার তাতে কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরের শীর্ষে বজ্র চিহ্ন অঙ্কিত যে পতাকা উড়ছে তা নিবেদিতা কর্তৃক স্বীকৃত চিহ্ন। এই চিহ্ন নিবেদিতা তাঁর গ্রন্থে ব্যবহার করতেন। আর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠানিক লোগো ওই বজ্রচিহ্ন। ফোয়ারার নীচে রক্ষিত আছে নিবেদিতার কিছুটা চিতাভষ্ম যা জগদীশচন্দ্রের নির্দেশেই রক্ষিত আছে। এমন কি ফোয়ারার জলধারের উপর ঝুঁকে পড়া শেফালি গাছ, যার বীজ নিবেদিতা অজন্তা গুহায় বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তারই একটি চারা রোপিত হয়েছিল। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কোথাও নিবেদিতার নাম খোদিত নেই। তাঁর উপস্থিতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম তিন গবেষণা গ্রন্থের পাতায় পাতায় কোন লিখিত স্বীকৃতি ছাড়াই।

১৯১৭ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ ভাষণে চকিতে একবার উল্লেখ করেন - 'যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দু-একজনের বিশ্বাস আমাকে বেস্টন করে রাখিয়াছিল। আজ তাহারা মৃত্যুর পরপারে'। কারো নাম উল্লেখ করা না হলেও বোঝা যায় যে তিনি নিবেদিতার কথাই বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ এক অপরিচিত ভাষা, সম্পর্কের এ এক অচেনা ব্যাকরণ। এ সম্পর্ককে আমাদের চেনা জানা কোন সামাজিক ছকে ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না। এ এক অন্যরকম ভালোবাসা, অন্যরকম নির্ভরতা। অন্যরকম বিশ্বস্ততা। এ সম্পর্ক অন্যরকম। একেবারেই অন্যরকম।

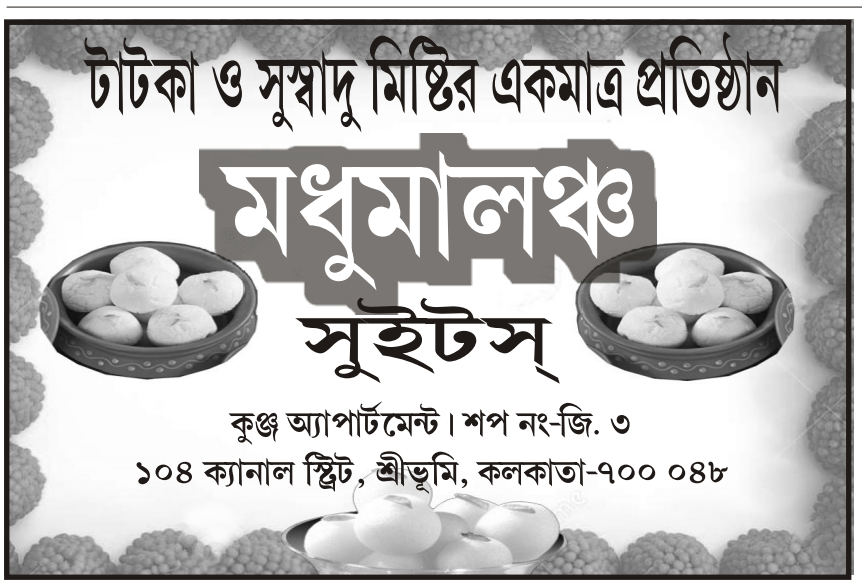

মাদার টেরেসা

১ পাতার পর

এদেশে এসে তিনি দার্জিলিং চলে যান এবং সেখানেই ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি শিখে প্রায় ২ বছর শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করেন। অবশেষে ১৯৩১ সালের ২৫ শে মে, ধর্মের পথে নিজেকে সম্পূর্নভাবে সমর্পন করলেন ও শপথ নিলেন। তাঁর জীবন হবে এক কুমারীর, একজন সাধারণ গরীব সেবকের, এবং শিশুদের ভবিষ্যতের নব আলোক দেখাবার দিশারী হিসেবে।

দীক্ষিত হবার পরে টেরেসা কোলকাতার এন্টালী লোরেটো স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, এবং অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে স্কুলের সর্বোচ্চ পদ - হেডমিস্ট্রেস হন।

মাত্র ২৭ বছর বয়সে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ধর্মীয় শপথ যে আর ফিরে তাকানো নয়, সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত জীবন মহান যীশুর পায়ে নিবেদিত হল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা/প্রভু তোমার পানে" -- বিশ্বের দ্বারে তিনি পরিচিত হলেন মাদার টেরেসা রূপে।

এই ধর্মীয় জীবন কখনই মসৃণ ছিল না। স্কুলের শিক্ষকতা টেরেসার অত্যন্ত প্রিয় কাজ ছিল-কিন্তু জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য, বহু মানুষের সেবার তাঁর মন সব সময় উন্মুখ থাকত। প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের ডাক শুনতে পেতেন। সব কিছু ছেড়ে গরীর দুঃখীদের বস্তিতে গিয়ে, তাদের পাশে থেকে, অসুস্থদের সেবাকাজ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে মানুষের যে চরম দুর্দশা ও দারিদ্রতা- বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁকে খুব ব্যথিত করেছিল। দার্জিলিং টেরেসার খুব প্রিয় স্থান ছিল। প্রতি বছর তিনি সেখানে নির্জন বাসের জন্য যেতেন এবং নিঃশব্দ প্রার্থনায় সময় কাটাতেন।

বৃহত্তর কর্মুদ্দেশ্য প্রথমে পরিবার ও পরে তাঁর প্রিয় লোরেটো স্কুল ছাড়তে হল। তখন তাঁর পোষাক হল নীল পাড় সাদা শাড়ী যে রূপ আমাদের সকলের অতি পরিচিত।

৩৮ বছর বয়সে টেরেসা পাটনাতে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নার্সিং ও মেডিকেল ট্রেনিং নিতে যান। সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে ট্যাংরা, তিলজলা অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল খোলেন। সে সময় মাদার অসম্ভব আর্থিক অসুবিধে ও একাকিত্বের মধ্যে কাটিয়েছেন। কোনোরকমে লোকের কাছে হাত পেতে ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রেখে অত্যন্ত সংযমের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছেন। ১৯৫১ সালে টেরেসা ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এরপর কোলকাতা কর্পোরেশন থেকে তাঁকে কালীঘাট মন্দিরের খুব কাছে একটি পুরনো বাড়ী ব্যবহারের জন্য দেয়। এর আগেই মাদার ক্যথলিক চার্চ থেকে এদেশে দুঃস্থদের জন্য আশ্রম করবার অনুমোদন পান। কালীঘাটেই প্রথম শুরু হল গরীব মৃত্যুপথযাত্রীদের একটি আশ্রয় স্থল যার নাম "নির্মল হৃদয়"। যাদের কেউ দেখার নেই, কোনোরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে দিন কাটায়, সেসব দুঃখী মানুষদের কাছে যেন মাদার দেবদূতের মত আবির্ভূত হলেন। নিজের হাতে সমস্ত আবাসিকদের স্নান করানো, খাওয়ালো, সংস্থার চারপাশ পরিষ্কার করা - সব কাজ করতেন।

১৯৫৩ সালে বেশ কিছু অনুরাগী সিস্টার তাঁর কাজে যোগ দেন। ১৪, ক্রিক লেন তখন বেশ কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। মাদারের উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া ও মিষ্টি ব্যবহার সদা হাস্যমুখ সকলকে উৎসাহ দিত। এর পর ৫৪ নং লোয়ার সারকুলার রোডে একটি বড় বাড়ীর ব্যবস্থা হল। এই বাড়ীটিই "মাদার্স হাউস" নামে পরিচিত। মিশনারিস অফ চ্যারিটির প্রধান কেন্দ্র স্থল।

ইতিমধ্যে মাদারের পরিচিতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। দিল্লী, মুম্বাই, রাচী- এসব জায়গাতেও বাড়ী নিয়ে সেবার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ততদিনে বহু মেয়েরা নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন রকম সেবার কাজে যুক্ত হয়েছে।

আর্তের সেবা, সকলের মধ্যে ভালোবাসা, করুণা বিলিয়ে দেওয়া- এই হল প্রভু যীশুর প্রধান উপদেশ। মাদার টেরেসা ছিলেন একেবারেই যীশুর মানস কন্যা।

১৯৬৫ ,সালে ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও "মিশনারিস অফ চ্যারিটির" অন্যান্য শাখা খুলতে আরম্ভ করেছে। ভেনিজুয়েলা, ইটালীতে, রোম, তান্‌জানিয়া, অস্ট্রিয়াতে পর পর বেশ কিছু শাখা খোলা হয়েছে। মাদারের দ্বারা ব্রাদার্সদের জন্য আশ্রম খোলা হল। ধর্মযাজকদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য ফাদার্সদের হোম খোলা হল। মাদার টেরেসা তখন একটি বিশ্ববন্দিত নাম।

ভারতবর্ষের মাটিতে এসে ভারতের মানুষকেই তিনি সর্বপ্রথম নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করেছেন। তাই দেশ তাঁকে ১৯৬২ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মাণিত করে। ১৯৭২ সালে জওহরলাল নেহেরু পদক গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে ভারতরত্ন উপাধী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

মাদার এইসব সম্মান, পদক একেবারেই উপভোগ করতেন না। সারা পৃথিবীর মূর্মূষু মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে একটু আহার তুলে দেওয়া, জীবনের প্রতিটি মূহুর্তেই ছিল এই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান।

মাদারের সেবার কাজ এত বিস্তার লাভ করেছিল যে প্রায়ই স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন শাখায় তাঁকে যেতে হত। কিন্তু কোলকাতার "মাদাব্‌স হাউস-ই" ছিল সবথেকে তাঁর প্রিয় স্থান। ৭৩ বছর বয়সে বিদেশে গিয়ে পড়ে যান। হৃদরোগেও আক্রান্ত হন। "মিশনারিজ অব চ্যারিটির" ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন এবং নানারকম পরিকল্পনাও করছিলেন। এত বড় সেবার সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার কার ওপরে দেবেন। অবশেষে সিস্টার নির্মলা এই সংস্থার কর্ণধার হিসেবে নির্বাচিত হলেন। মাদার সর্বান্তঃকরণে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। ১৯৯৭ সালে মাদারের দেহাবসান হয়। তাঁর তখন ৮৭ বছর বয়স হয়েছিল। সেন্ট টমাস চার্চে তাঁর নশ্বর দেহ শায়িত ছিল। জনসাধারণের শেষ দর্শনের জন্য। হাজার হাজার দর্শনার্থী এই অসামাণ্য মানবীকে চোখের জলে বিদায় জানায়। ভারত সরকার মাদারকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে অন্তোষ্টিক্রিয়া করে। পৃথিবীর বহু সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২০০৩ সালে ক্যাথলিক চার্চের নিয়মানুসারে তিনি "সেইন্ট হুড" লাভ করেন। তবে মাদার ভারতের কাছে বড় আপনার মানুষ। ভারতীয়রা কত ভাগ্যবান যে এমন মানুষকে তারা কাছে পেয়েছে ও আশীর্বাদ ধন্য হয়েছে।

নিবেদিতা

১ পাতার পর

স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে তাঁর যেন আশ মেটেনা। কোথায় নেটিভ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত ভারতবর্ষ, তার এক অখ্যাত সন্যাসী, আর কোথায় সুসভ্য জাতির দেশ আয়ারল্যান্ড। শুরু হল এই দুই মেরুর মেলবন্ধন।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের টাইরন প্রদেশে মার্গারেটের জন্মগ্রহন। মাতামহ প্রদত্ত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পরে তিনি স্বামীজী প্রদত্ত ভগিনী নিবেদিতা dedicated to God নামে বাঙালীর হৃদয়ে স্থান করে নিলেন ১৮৯৮ সালে। কলকাতা আসার পরে ১৮৯৫ সালের আগে ১৮৯৩ সালে, শিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামীজীর দৃপ্ত ভাষণ তাঁর মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, যা হিন্দু ধর্মের মূলকথা, সেই ধর্মকে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বাণী অধ্যাপিকার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু ধর্মের প্রতীক স্বামীজীর সঙ্গে আলাপের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়। সুযোগ ঘটে লেডী মার্গারেটের সঙ্গে আলাপের পর। ঈশ্বর পিয়াসী মার্গারেটের ব্যাকুল মন স্বামীজীকে তাঁর পথ প্রদর্শক হিসেবে দেখতে পেলেন। কিন্তু না, স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে এমনই এক সিংহিনীর প্রয়োজন। যিনি নিজ পরাক্রমে সমস্ত বাধা বিঘ্নকে দূর করে নারী শিক্ষার অগ্রণী হবেন। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। স্বামীজী তাঁকে আরো আত্মসমীক্ষা করতে বললেন।

স্বামীজীর আদেশে মার্গারেট ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ সালে কলিকাতায় আসেন। ২৫শে মার্চ স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মমতে দিক্ষীত করেন।

এরপর স্বামীজীর আদেশে তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন।

ইংলন্ডের অধিনস্থ আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মার্গারেটের জন্মের আগেই। পরাধীন জাতির যে গ্লানি তা তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। সেকারণেই তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেন। বহু স্বদেশীকে সাহায্য করতেন। শ্রী অরবিন্দ পুলিশের তাড়া খেয়ে তাঁর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁকে মহিয়সী নারী রূপে সম্বোধণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডঃ প্রফুল্ল রায়, এস. এন. ব্যানার্জী প্রভৃতি মনিষীদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিলো। কোলকাতার ঘরে ঘরে ছোটো ছোটো বিধবা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের কিশোরী মেয়েদের অশিক্ষা খালি পায়ে হাঁটাচলা করা, ওঠাবসা দেখে মার্গারেট মনে খুব কষ্ট পেতেন। কি করে এদের শিক্ষিত করা যায়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন করা যায়, একটি আলোকিত কৈশোর দেওয়া যায়, সর্বক্ষণ তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় শ্রী শ্রী মা সারদামনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই সময়, অসম্ভব সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে, একজন বিধবা মহিলা সমাজের পন্ডিতদের শাসনের পরোয়া না করে এই বিদেশীনিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। শ্রী শ্রী মা নিবেদিতাকে বুকে করেছিলেন- বলেছিলেন, মতে বাধা আসলেও তুমি তোমার লক্ষে এগিয়ে যাবে। আমার আশীর্বাদ সব সময় তোমার সঙ্গে আছে। মা তাঁকে আদর করে খুকী সম্বোধণ করতেন। নিবেদিতা স্কুলের দ্বার উদঘাটন শ্রীমাই করেন। নিজের দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, একটি ভিন্ন দেশের মানবকল্যাণের জন্য, বিশেষ করে নারী জাতির শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যে মানুষের হৃদয় কাঁদে-তিনি কতবড় হৃদয়ের অধিকারিণী ভাবলেও বিষ্মিত হতে হয়। শিক্ষা ছাড়া যে কোনো জাতির অগ্রগতি অসম্ভব, সেই ভাবনাটাই তিনি দিতে চেয়েছিলেন। ১৯১১ সালে ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ তাঁর দেহাবসান হয়। এমন একজন নিঃস্বার্থ ভারতপ্রেমীকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ শতকোটি প্রণাম। আজ বছর দেড়শো পরেও নিবেদিতার সেই উজাড় করে দেওয়া ভালোবাসা আমরা অনুভব করি।

অ্যানি বেশান্ত

১ পাতার পর

তৈরী করে ছিলেন যাতে পরবর্ত্তীকালে অ্যানি বিশ্ববাসীকে কিছু দিতে পারে। মায়ের ভুলের জন্য নাবালিকা ঈশ্বর ভক্ত অ্যানি একজন খৃষ্টধর্মীয় যাজককে বিবাহ করেন এবং বিবাহসূত্রে অ্যানি বেশান্ত উপাধি লাভ করেন। তিনি বিবাহ করতে রাজী হয়েছিলেন শুধু এই ভেবে যে তাঁর স্বামী তাঁকে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হতে সক্ষম হবেন। যে প্রভু যীশুকে তিনি বাল্যকাল থেকে ঈশ্বরপূত্র রূপে শ্রদ্ধা করতেন সেই ঈশ্বরপূত্র ও ঈশ্বর তাঁর বিপদে ও কাতর আবেদনে সাড়া দেননি। ধর্মীয় যাজকের স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা ও পৈশাচিক আচরণ দেখে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। তিনি আলাদা থেকে তাঁর জীবন সাধনা চালিয়ে যান। লন্ডন শহরে ন্যাশন্যাল সেকুলার সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিশাল জনসভায় একজন বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা মিঃ ব্রডলফের সহিত অ্যানি বেশান্তের পরিচয় ও মিত্রতা হয়। মিঃ ব্রডলফ, অ্যানির বিভিন্ন লেখা ও তাঁর বাগ্মীতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

অ্যানি বেশান্ত লন্ডনে সাহসের সঙ্গে ধর্মীয় গোড়ামীর উপর বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্ম যাজকদের গোড়ামীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছেন। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে এক বিরাট জনসভায় তিনি যে ভাষন দেন তাতে পাশ্চাত্যে এক বিশাল সাড়া জেগেছিল। অ্যানি বেশান্তের লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কার দূর করা। তিনি বলতেন - "স্বাধীনতা প্রত্যেক নর-নারীর জন্মগত অধিকার। মুক্তমন ও আত্মোন্নতি তাঁকে বারবার উচ্চতায় ও মহানতায় উন্নীত করে। " তিনি বলতেন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক দমননীতি মানুষের মহত্ত্বের বিনাশ করে। মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সকল মানুষের সমান। আইনের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান থাকা দরকার। তাঁর প্রশ্ন সকলেই যদি ঈশ্বরের পুত্র তবে আমরা পরস্পর সৌভ্রাতৃত্বে বাস করতে পারি না কেন ? সমাজ কেন এত বৈসাদৃশ্য ? কে সৃষ্টি করেছে এইসব ?

একধারে ওজস্বিনী বক্তৃতা অন্যদিকে সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ লেখা অ্যানি বেশান্তের জনপ্রিয়তা ও পরিচিতিকে করেছে প্রশস্থ। ১৮৮৯ সালের এক বসন্তের সন্ধ্যা - অ্যানি বেশান্তের জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। নীরবে বসে বসে ভাবছেন, সব দুঃখময়, হতাশাপূর্ণ চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করে চলেছে। নিরাশা ও বেদনায় ম্রিয়মান তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অ্যানি বেশান্ত এক স্বর্গীয় মধুময় সুর শুনতে পেলেন - "Take Courage, the light is near"। গায়ে শিহরণ হল - একি শুনলাম। কেটে গেল ১৫টি দিন। এরপর একদিন ডব্লিউ, টি স্টিক নামক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক দুইটি বই নিয়ে অ্যানি বেশান্তের কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, "Can you review these?" অ্যানি বেশান্ত বই দুইটি ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির লেখা সিক্রেট ডকট্রিনের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড।

অ্যানি বেশান্ত বই দুইটি বাড়ী নিয়ে গিয়ে একাগ্রচিত্তে পড়তে শুরু করলেন। যতই পড়েন ততই তাঁর পড়ার উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে, - ভাবে তিনি তন্ময় হয়ে যান। এ যে আমার মনের কথা, আমি প্রকৃতপক্ষে যা চাই তারই স্বরূপ।

অ্যানি বেশান্ত গ্রন্থ সমালোচনা লিখে মিঃ ষ্টিডের Stead) হাতে দিয়ে বললেন, "ম্যাডাম

ব্লাভাটস্কির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিন।" সুযোগ এল। তখন লন্ডনের ১৭নং লেন্ডস ডাউন রোডে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি থাকেন। অ্যানি বেশান্ত অতি বিনম্রভাবে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সম্মুখে আসলে এক কম্পিত কণ্ঠস্বর তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত করল - "My dear Mrs. Besant I have so long wished to see you". ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অ্যানি বেশান্তের মনের সকল বেদনাকে পুড়ে ছাই করে দিয়ে এক অনাবিল স্নেহের বন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ করল। অ্যানি বেশান্ত চিন্তার জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে যা করতে চান এ যেন সেই পথ আর ম্যাডাম ব্লাভাটস্কিই তাঁর প্রকৃত পথ প্রদর্শক।

অ্যানি বেশান্ত থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ডিপ্লোমা হাতে নিয়ে সোজা ল্যান্স ডাউন স্ট্রীটে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেইদিন H.P.B. ঘরে একাই ছিলেন। অ্যানি বেশান্ত হাঁটু পেতে বসে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কিকে শ্রদ্ধা জানালেন, তাঁকে চুম্বন করলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। এই এক স্বর্গীয় অনভূতি, অনির্বচনীয় আনন্দ, যোগ্য গুরুর নিকট যোগ্য শিষ্যার দীক্ষা, অবিস্মরণীয় দিন ১০ই মে ১৮৮৯ খৃঃ। এই দিন থেকে H.P.B.র দেহাবসান কাল পর্যন্ত ৮/৫/১৮৯১ এক মুহূর্তের জন্য অ্যানি বেশান্তের মনে তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ জাগে নি। এই ঘটনা অ্যানি বেশান্তর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করে - সমাজতান্ত্রিক অ্যানি বেশান্ত প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হন। এ এক অনির্বচনীয় অনুভূতির জগত যার ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী, যোগসিদ্ধা, পরম সাধিকা হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাটস্কি একদা নাস্তিক ও সমাজতন্ত্রী নেত্রী অ্যানি বেশান্তকে এক নূতন দিব্য জগতের সন্ধান দিলেন। এই রূপান্তর অ্যানি বেশান্তের জীবনে নিয়ে এল পরম শান্তিময় কর্মউদ্দিপনা যার ফলে তিনি হলেন মহীয়সী ও বিশ্ববন্দিতা। মহাত্মাদের মহৎকর্মে এই মণিকাঞ্চন যোগ পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে ঘটেছে। একই সময়ে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্তের ঈশ্বর বিষয় সংশয় ঘুচেছে - তিনি বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ হয়ে ভারতাত্মার বাণী প্রচারে - পরিব্রাজক এবং বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ববরণীয় হন এবং অ্যানি বেশান্তের সহিত বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন বক্তৃতা দিয়ে ঐ বৎসর ১৬ই নভেম্বর অ্যানি বেশান্ত তীর্থযাত্রীরূপে ভারতবর্ষে এসেছিলেন কিন্তু এদেশে এসে দেখলেন যে ভারতবাসীরা তাঁদের পূর্বপুরুষের জ্ঞান, ঐতিহ্য ও শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছেন। তখন তিনি আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করে বলতে লাগলেন, "ওঠো, জাগো তোমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হও। এই মহান দেশ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হও। স্বাধীনতা তোমাদের জন্মগত অধিকার।" একজন ব্রিটিশ মহিলা হয়েও তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এবং দুই বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা স্থানে দুইশতাধিক বক্তৃতা দিয়ে ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছিলেন। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল সভায় অ্যানি বেশান্ত বক্তৃতা দেন। অনেক লোক হলে স্থান না পেয়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনেন। ঐ সভায় অনেক ইংরাজী শিক্ষিত যুবক যোগদান করেন। বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ও বেঙ্গল ফেডারেশনের ভবিষ্যত কর্ণধার মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অ্যানি বেশান্তের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি হোমরুল লীগ''-এর অন্যতম স্থপয়িতা। জন্মসূত্রে বিদেশী হলেও তিনি আমাদের চেয়ে অধিক ভারতীয় ছিলেন। এই মহীয়সী নারীর সান্নিধ্য ও শিক্ষা অনেক ভারতবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে অ্যানি বেশান্তের অবদান অসাধারণ। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই পূণ্যস্মৃতি বহন করে। তাঁর পালিত পুত্র জে। কৃষ্ণমূর্ত্তি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও World Teacher রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অ্যানি বেশান্ত ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই শতাধিক পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন।

অ্যানি বেশান্তের উদাত্ত আহ্বানঃ

"হে ভারতবাসী, তোমরা এক হও। যতদিন হিন্দু, জরথুষ্ট্র পন্থী, খৃষ্টান এবং মুসলমান পরস্পরকে বুঝতে সক্ষম না হবে, ততদিন ভারতবর্ষ কখনই একজাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আমরা উভয়েই ভারতীয়, আমরা উভয়েই একই দেশমাতৃকার সন্তানরূপে এই পৃথিবীতে প্রথম আলোক দর্শন করেছি''। তিনি অখন্ড ভারতের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

অ্যানি বেশান্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে জীব সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি যে সেবার কথা বলতেন তা শুধু অর্থ ও খাদ্য দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া নয়। এই সেবাতে সেবকের অন্তরে অনুভূতি ও ভালবাসা থাকা চাই। এই কাজের জন্য তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে টি.ও.এস. নামক সেবাধর্মী একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা এখনও বিশেষ সক্রিয়। তাঁর প্রদর্শিত সেবাধর্ম পালন করে আমরাও যেন হতে পারি ঋদ্ধ ও কৃতার্থ।

সংঘ সংবাদ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকে প্রতি দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এখানে নিয়মিত ডিজিটাল এক্সরে, ইকো-কার্ডিওগ্রাম, কালার ডপলার এসব পরিষেবার ব্যবস্থা আছে। প্যাথোলজি বিভাগটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুগার, লিপিড প্রোফাইল, থাইরয়েড এরকম বিভিন্ন প্রকারের রক্ত পরিক্ষা এখানে নিয়মিত করা হচ্ছে। নাম নথি ভুক্ত করে আসলে ভালো হয়। হাসপাতালের ফোন নম্বর - ২৫৩৪৫৫৭৯/ ৯৯০৩৩২১৭৭৭ এখানকার E-mail no: gsshospitalkolkata@gmail.com

বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এখানে আসছেন। আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, আপনারা এখানে আসুন এবং হাসপাতালের পরিষেবা গ্রহণ করুন। জনসাধারণের সুবিধার্থেই স্বল্প মূল্যে স্বনামধন্য ডাক্তাররা এই পরিষেবা দিচ্ছেন। আমাদের প্রয়াস যত বেশি মানুষকে এই সুযোগ দেওয়া।

শুভানুধ্যায়ী
আপনাদের উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সার্বিকভাবেই সফল হোক। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।
তপন চৌধুরি, শ্রীভূমি, কলকাতা।

ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশন
মাণিক্য মঞ্চ
প্রতি মাসের প্রথম রবিবার নাটক প্রদর্শন ইচ্ছুক নাট্যো দলগুলিকে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কল-৪৮
নির্মল শিকদার: ৯৮৩০০৯৭৩৮,
ধনঞ্জয় আঢ্য: ৯৬৭৪০৬০৪৫০
email: ekco2006@gmail.com

OPD Dr. LIST GANDHI SEVA SADAN HOSPITAL

Daily From 8 am to 8pm

For Details & Appointment please Call 9903321777 & 033-2534-5579, E-mail : gsshospitalkolkata@gmail.com

Sunday Closed

		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
MEDICINE							
DR. T K. CHATTARAJ	MD					9am	
DR. SUDIPTA CHATTERJEE	MD(Med), DNB (Med)		4pm			4pm	
DR. SUBHODIP PAUL	MD, MRCGP		By Appointment				
DR. B. K. GUPTA	MBBS, MD(Gold Med)				6pm		
Dr. TAMAL DAS	MD(Med), Chandigar, DTM			4pm	4pm		
DR. PRIYADARSHI BAGCHI	MD(Med), PGDCC(Card)	6pm		6pm			6pm
DR. A V AGARWAL	MBBS, DNB (Family Med)	11am		11am			
DIABETOLOGY							
DR. S. B ROYCHOUDHURY	MBBS, MRCP,MSc(Diab)		4pm				
CARDIOLOGY							
DR. SWAPAN DEY	MD, DM(Card)				9am		
GASTROENTEROLOGY							
DR. SUBHABRATA GANGULY	MD, DM(Card)		7pm				
DR. ASISH KR. SAHA	MD. FRCP(Ed), FRCP(Gls), FACP (US)	6pm				6pm	
ORTHOPAEDIC							
DR. A. K. SINGH	D.OTHRO, MS(Ortho)Mrcs Ed(uk)			4pm			4-6pm
DR. T. KARMAKAR	MS(Ortho)		7pm				
GYNAECOLOGY & OBSTETRICS							
DR. B. N. DHAR	MD, DGO, FSIS		By Appointment				
DR. D. GANGULY	MD, DGO, FSIS	12am				4pm	11am
DR. BIBHASWATI ROY	MD, D&O		11am		11am		
DR. TRINA SENGUPTA	MBBS, DGO, DNB		10am		10am		
DR. RICHA HATILA	MS(O&G), BNB(O&G)			4pm		12am	
PAEDIATRIC							
DR. T. K. DAS	MBBS, DCH		9am		9am		9am
DR. TAPAS CHANDRA	MBBS(Cal), PGDMCH		By Appointment				
DR. KRISHNENDU KHAN	DNB(1), MIAP(Ass)	5pm				5pm	
GENERAL PHYSICIAN							
DR. SAYANTAN MANNA	MBBS			11am			
DR. Col. AMITABHA GHOSH	MBBS		9am			9am	
DR. ARPAN HALDER	MD						6pm
CHEST MEDICINE							
DR. A. C. KUNDU	MBBS, DTCD(Cal)	1-30pm		1.30pm			1.30pm
FAMILY MEDICINE & SKIN							
DR. JOY BASU	MBBS, DNB, FRSM(Lond)	6pm			6pm		
DR. SUBHAS KUNDU	MBBS,DVS,ISHA(Banglore)		11am				
GENERAL SURGERY							
DR. DIPTENDU SINHA	MS, FAIS	11am		11am			
DR. S. S. MONDAL	FS, MS, FISGES		4pm		4pm		
DR> SUSENJIT PRADHAN MAHATO	MS		12am				9am
PSYCHIATRY							
DR.(Col) PRADYUT SARKAR	MD		4pm				4pm
ONCOLOGY							
DR.Prof. SRIKRISHNA MONDAL	MD(PGMIR, Chandigarh)		By Appointment				
ENT							
DR. Prof. AJIT SAHA	MBBS(Gold), MS,DLO(Lond)		11am		11am		
DR. (Col) SOURAV CHANDRA	RCS(ENG), MS(ENG) MBBS DLO MS(Cal)	6pm		6pm	6pm		11am
EYE							
DR. SAIBAL MAITRA	MS(OPHTH)			6pm			6pm
DR. RUPAM ROY	MS(OPHTH)	6pm					
UROLOGY							
DR. SANDEEP GUPTA	MS, MCh(Urology & Kidney Transplant)				2pm		
DENTAL							
DR. SIDDHARTHA CHAKRABORTY	MDS						
DR. S. SANTRA	BDS	10am	10am			10am	
DR. ATREYI CHAKRABORTY	BDS		4pm				4pm
DR. DEBASREE BANIK	BDS	4pm		10am			
DR. SANTANU MUKHERJEE	BDS			4pm	10am		
DR. PRADIPTA ROUCHOUDHURY	BDS				4pm	4pm	10am

Doctors Consultation Fees Rs. 100, 150 and 200 only
Reliable Investigation Available Digital X-Ray, USG, ECHO, COLOUR Doppler & Pathology
All at Subsidised & Affortable Rates.

Digital X-Ray Starting from Rs.150/-
USG : hole Abdomen Rs.800/-
Laboratory Tests Starting from Rs.30/-

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ১৫তম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com